এইসময়
সংবাদপত্র

কথাসরিৎ

পাশ্চাত্য হইতে যদি কিছু আমাদের গ্রহণ করিতে হয় তবে ভারতের উপযোগী করিয়া তাহা লইব।

অরবিন্দ ঘোষ

গণতন্ত্র এবং সংবাদমাধ্যম

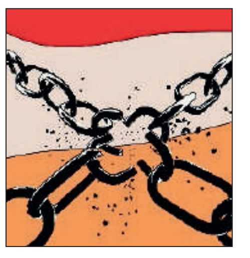

আবার সে এসেছে ফিরিয়া। ইংরেজিতে যাকে 'ইন্টারনেট ন্যাস্টিনেস' বলা হচ্ছে, বাংলা করলে দাঁড়ায় আন্তর্জালে অসদাচরণ, অর্থাৎ অনলাইন মাধ্যমে কাউকে হিংসার মুখে ফেলা। সংবাদে প্রকাশ, ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের এক সাংবাদিক সমাজমাধ্যমে একের পর এক 'হুমকি'র শিকার হয়েছেন। এবং তার পরে সেই ঘটনার 'নিন্দা' করেছেন হোয়াইট হাউসের দুই প্রবীণ আধিকারিক, ফলত আন্তর্জালে অসদাচরণের সমস্যাটি ফের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে উঠে এসেছে। ইউএসএ-র নাগরিক সাব্রিনা সিদ্দিকি-র জাতিগত পরিচয় ও গোষ্ঠীগত পরিচিতি নিয়ে ট্রোল করা হয়েছে, যা ভয়ানক ভাবে ন্যক্কারজনক। যদিও এ-ও মনে রাখা দরকার যে, এই আচরণ একেবারেই নতুন নয়, এমনকী ভারতের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধও নয়। এই বিশেষ ঘটনার ক্ষেত্রে ফারাকটি শুধুমাত্র তার প্রেক্ষাপটে— দুই সর্ববৃহৎ গণতন্ত্রের দুই সরকারের প্রধানের বহুল প্রচারিত একটি যৌথ সাংবাদিক সম্মেলনে ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে সংখ্যালঘুদের অধিকার ও বাকস্বাধীনতা বিষয়ে প্রশ্ন করেছিলেন সিদ্দিকি। তাঁকে যাঁরা আক্রমণ করছেন তাঁরা হয়তো একটি বিষয় ভুলে গিয়েছেন (অথবা ইচ্ছাকৃত ভাবে এড়িয়ে গিয়েছেন)। তা হল, সিদ্দিকির প্রশ্নটি প্রধানমন্ত্রী মোদী গ্রহণ করেছিলেন, সেটির জবাবও দিয়েছিলেন। হোয়াইট হাউসের মুখপাত্র এই 'হেনস্থা' প্রসঙ্গে বলেছেন, 'গণতন্ত্রের যে বুনিয়াদি নীতিমালা এই রাষ্ট্রীয় সফরে দেখা গিয়েছিল এই আচরণ তার বিরোধী।'

এই সময়ে দাঁড়িয়ে এই বিষয়টি স্পষ্ট ভাবে উল্লেখ করা অত্যন্ত জরুরি। কোনও প্রশ্ন করার জন্য— হোয়াইট হাউসের প্রেস সচিবের ভাষায় 'তাঁদের কাজটি করার চেষ্টার জন্য'— সাংবাদিকদের হেনস্থার মুখে পড়তে হওয়ার ঘটনা অন্যায়। এবং তাঁরা যদি হুমকির মুখে পড়েন, তা হলে গণতন্ত্রের অংশীদারদের পক্ষ থেকে এমন ধরনের আচরণের দ্ব্যর্থহীন নিন্দা করাও প্রয়োজন, হেনস্থার শিকার ব্যক্তি রাজনৈতিক বিভাজনের যে কূলেই বাস করুন না কেন। ভারতে বিষয়টি ভিন্ন মাত্রা পায়, কেননা এই দেশে ট্রোল করার পাশাপাশি পুলিশকেও ভোঁতা অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে, যা বস্তুত সমস্ত রাজনৈতিক রাজনৈতিক দলেরই হাতিয়ারস্বরূপ। ভারতে মোটের উপর সব দলই বিশ্বাস করে যে, আপন দায়িত্ব পালনে যে সব সাংবাদিক আক্রান্ত হচ্ছেন, তাঁদের রক্ষা করা রাজনৈতিক নেতাদের কাজ নয়। কিন্তু নেতাদেরও এ কথা মনে রাখা উচিত যে, কোনও গণতন্ত্র— বিশেষত যা ভারতের মতো বৃহৎ ও বিচিত্র— সেটি তার নিজস্ব চরিত্রের কারণেই প্রবল ভাবে তর্কশীল। অতএব, সেখানে প্রশ্ন থাকবেই, প্রশ্ন থাকা বাঞ্ছনীয়ও বটে। সেই হিসাবেই একটি কথা বল যায়। হোয়াইট হাউসের এই হস্তক্ষেপ স্রেফ ঘটনার পরিসর পার করে একটি বৃহত্তর বার্তা দিয়ে গেল।

কাণ্ডজ্ঞান এবং দুর্ঘটনা

পথদুর্ঘটনার বার্ষিক সংখ্যাটিকে অনেকখানি কমিয়ে আনা যায় রাস্তার হাল ফেরাতে পারলে। বিশেষজ্ঞদের তেমনই যুক্তি। আন্তঃরাজ্য জাতীয় সড়কগুলির দিকে চাইলে ওই যুক্তি মোতাবেক কাজ হয়েছে বুঝতে অসুবিধে হওয়ার কথা নয়। গত কয়েক দশকে দেশের মূল সড়কগুলি আন্তর্জাতিক স্তরে পৌঁছেছে, যদিও অর্থাভাবের ফলে অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার দিকে নজর দেওয়া হয়তো সম্ভব হয়নি। কাণ্ডজ্ঞান বজায় রেখে জীবন অতিবাহিত করার ইচ্ছা মনে জন্মালে পথদুর্ঘটনার সংখ্যাটিকে আরও কতখানি কমানো যায়, সে সম্পর্কে জাতীয় কমিশনে কিছু বলা নেই, তবে নাগরিকগণ বিষয়টি সম্পর্কে নিজেরা খানিক চিন্তাভাবনা করলে সকলের সুবিধে। তার প্রধান কারণ, গাড়ি চালানোর কালে কারও মতিচ্ছন্ন হওয়া বা না-হওয়ার উপর তার একার দুর্ঘটনাগ্রস্ত হওয়াটি নির্ভর করে না। এটি বিশেষত সত্যি জাতীয় সড়কের ক্ষেত্রে, যেখানে দ্রুতগতি সম্পন্ন যানবাহন সর্বক্ষণ চলতেই থাকে। অতএব প্রচুর আলোর ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও গভীর রাতে মোটর সাইকেল আরোহীদের মৃত্যু কতখানি অসাবধানতা বশত, আর কতটাই বা বর্ষার প্রথম কয়েক পশলায় পিচ্ছিল পথের কারণে, সেটি নিশ্চিত রূপে অনুধাবন সম্ভব নয়। দুঃখজনক হলেও, এই সংখ্যাটি বেড়েই চলবে যদি না চালকরা আরও সাবধান হয়।

অসংখ্যা

৩১১০০০

(তিন লক্ষ এগারো হাজার)— ২০১৮ সালের হিসেবে গোটা বিশ্বে সার্ভাইক্যাল ক্যান্সারে প্রতি বছর যত মেয়ের মৃত্যু হয়। সূত্র: ইনটেকওপেন

দিনকেদিন

৩০ জুন

১৮৫৫: ভারতে ব্রিটিশ শাসন ও জমিদারি প্রথার বিরুদ্ধে সিধু মুর্মু ও কান্‌হু মুর্মুর নেতৃত্বে সাঁওতাল বিদ্রোহ শুরু হয়। প্রায় ষাট হাজার সাঁওতাল এই বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

১৯৬৬: মাইক টাইসন জন্মগ্রহণ করেন নিউ ইয়র্কে। ৫৮টি বক্সিং ম্যাচে ৫০টিই জিতেছেন, ছ'টি হার। তিনি 'আয়রন মাইক' ও 'কিড ডায়নামাইট' নামেও পরিচিত।

মনকে বড় করার সাধনা

শ্রীশ্রীআনন্দমূর্তি

বোধিবৃক্ষ

৩৯ বৎসরের পর থেকে আস্তে আস্তে শরীর শীর্ণ হয়ে যায়, শুকিয়ে যায়। তাই ৩৯ বৎসরের পর থেকে শরীরকে বলা হয় শরীর— শরীর মানে শীর্ণ হয়ে যাওয়া যার স্বভাব, শুকিয়ে যাওয়া, ধ্বংস হয়ে যাওয়া যার স্বভাব। 'তন্' মানে বিস্তারিত হওয়া। তাই তন্ত্র মানে বিস্তৃতির দ্বারা যে মানুষকে ত্রাণের রাস্তা দেখায়। তাহলে তন্ত্রের দুটো মানে হল, কিন্তু দুটো মানে আসলে একই। মানুষের সাধনাটা কেমন হবে? মানুষের বন্ধন, মানুষের ক্ষুদ্রতা কোথায়? না মনেতে। যার মন ছোট, সেই ছোট। যার মন বড়, সেই বড়। সাধনা হল মনকে বড় করার সাধনা। আর মনকে বড় কীভাবে করা যায়? না, মনের ধর্ম হল, যা ভাবা যায় মন তাই হয়ে যায়। সেই বিরাট পুরুষের, পরমপুরুষের ভাবনা নেওয়াই হল আসল সাধনা। কারণ পরমপুরুষের চেয়ে বড় আর কেউ নেই। আর এই ভাবনা নিতে গেলেই মন বড় হয়ে যায়। এই যে জড়তার বন্ধন মনে ছিল, প্রকৃতির বন্ধন ছিল, যা মনকে বেঁধে রেখেছিল— কিন্তু মনটা যদি বিরাট হয়ে যায়, তাহলে সেই বস্তুটার কী অবস্থা হবে? মনে কর, তোমাকে কেউ দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখলো আর তোমার শরীরকে তুমি বড় করে তুললে, তখন সেই দড়িটার অবস্থা কী হবে? ছিঁড়ে যাবে। ঠিক তেমনি প্রকৃতির যে বন্ধনের জন্যে আজ তুমি ক্ষুদ্র মনের মানুষ, মনকে তুমি বাড়িয়ে ফেল, তাহলে বন্ধন ছিঁড়ে যাবে। এই হল তন্ত্র।

('তন্ত্রই সাধনা সাধনাই তন্ত্র' থেকে গৃহীত)

মহারাষ্ট্রে জনৈক ব্যক্তি বোনের পোশাকে প্রথম ঋতুর রক্ত দেখে শারীরিক সম্পর্কের সন্দেহে হত্যা করে

ঋতুকালীন স্বাস্থ্য শুধুমাত্র মেয়েদের সমস্যা?

নিজের জীবন ও সমাজের প্রয়োজনেই পুরুষেরও ঋতু সম্পর্কে চেতনা প্রয়োজন। অথচ তা নিয়ে কোনও কথা হয় না। লিখছেন **শাশ্বতী ঘোষ**

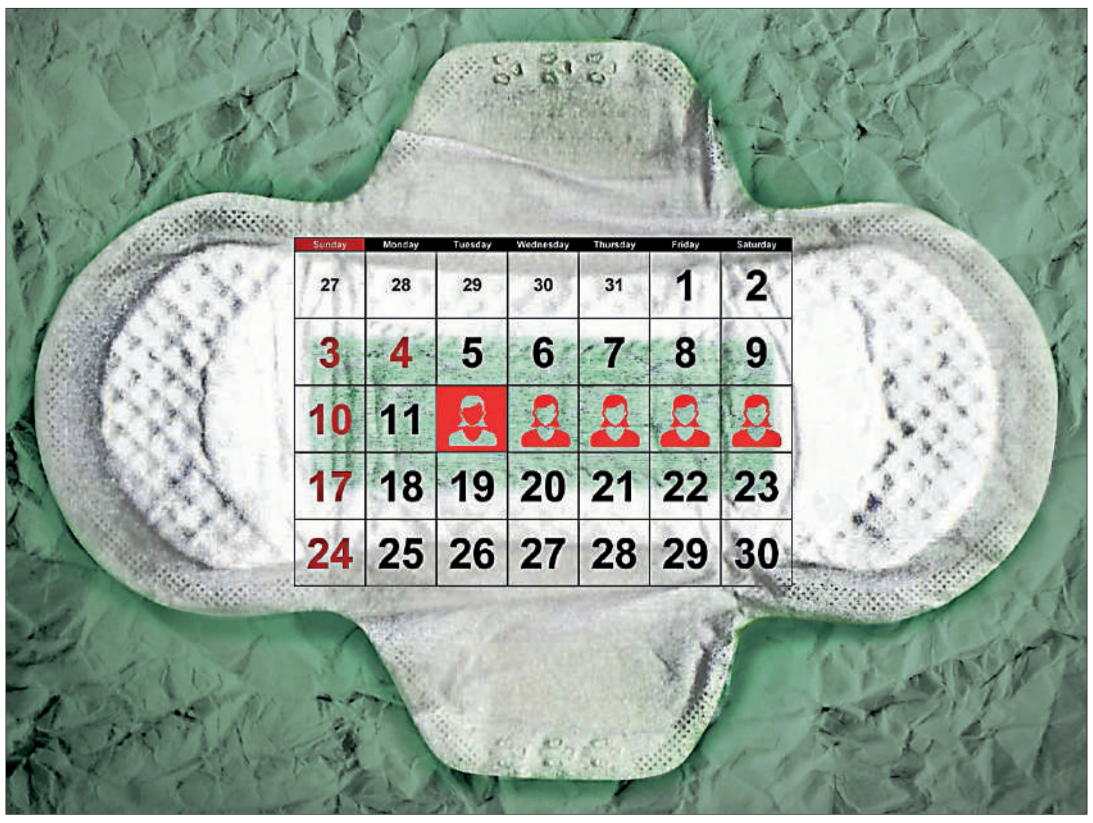

চোপ! পিরিয়ড চলছে। ঋতু সম্পর্কে নীরবতাই রেওয়াজ, বিশেষত পুরুষদের ক্ষেত্রে

অরিন্দম মজুমদার

বিশ্ব জুড়েই ২৮ মে দিনটি পালিত হয় ঋতুকালীন স্বাস্থ্যের বিষয়টি মনে করাতে। এই বছরেও 'মেয়েদের ওই বিশেষ দিনগুলিতে' কী করতে হবে, তাই নিয়ে নানা অনুষ্ঠান হয়েছে। আসলে সেটাই সমস্যা। যে কোনও বিষয়ই 'মেয়েদের বিশেষ সমস্যা' বলে দাগিয়ে দিলে তা নিয়ে যে অন্য সব মানুষদের, বা এক কথায় পুরুষদেরও জানা প্রয়োজন, তা আর মনে হয় না। অথচ ঋতুমতী হবে মেয়েরা, এটা এতই স্বাভাবিক আর প্রয়োজনীয় একটি জৈবিক ঘটনা যে তা না হলেই বরং চিন্তার, তা নিয়ে সর্বস্তরে আলোচনা কই? আজ রূপান্তরিত পুরুষরাও কৃত্রিম প্রজননের সাহায্য নিয়ে গর্ভধারণ করছে, কিন্তু মেয়েরা যদি গর্ভধারণ করতে অস্বীকার করে, স্বাভাবিক প্রজনন বন্ধ হয়ে যায়, নতুন মানুষ আসবে কোথা থেকে? সেই ভাবনার জায়গায় ধাক্কা দিতেই ঋতুকালীন স্বাস্থ্য চেতনা আজ মেয়েদের গণ্ডি ছাড়িয়ে নানা বয়সের পুরুষদের কাছেও পৌঁছতে চেষ্টা করছে। পারছে কি?

ঋতুর জন্যে নিহত

পারলে কেন মহারাষ্ট্রের উল্লাসনগরের এক নাইটগার্ড তাঁর কিশোরী বোনটির পোশাকে প্রথম ঋতুর রক্ত দেখে সকলের অজ্ঞাতে কোনও পুরুষের সঙ্গে শারীরিক সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ার সন্দেহে গরম চিমটের ছ্যাঁকা দিয়ে মারবে? তিরিশ বছরের এক বিবাহিত পুরুষ তার স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও ঋতু সম্বন্ধে কিছুই জানে না? এই পরিবারটি সম্বন্ধে কোনও বিস্তারে সংবাদ খুঁজে পাইনি। প্রশ্ন অনেক। সেই পুরুষটির স্ত্রী কি কখনও সন্তান ধারণ করেনি যাতে ঋতুমতী হওয়া, সন্তান ধারণের সঙ্গে ঋতু বন্ধ হয়ে যাওয়া, এ সব নিয়ে পুরুষটির কোনও ধারণাই ছিল না? মেয়েটির বউদিও কি তার এই কিশোরী ননদিনী ঋতুমতী হয়েছে লক্ষ করে তাকে বুঝিয়ে বলার, প্যাড বা পুরনো কাপড় কী করে ব্যবহার করতে হয় শেখানো, এ সব কিছুই করার অবকাশ পায়নি? কিশোরীর ভয় দূর করা, বলা যে এটা খুব স্বাভাবিক একটি বিষয়, তার পরে স্বামীকে আড়ালে 'বোন বড়ো হয়েছে' বা এমনকী বিয়ের ব্যবস্থা করার জন্য পাত্র দেখতে বলার কথাও সেখানে আসতে পারতো। সে সব কেন হয়নি জানি না। আর প্রশ্ন জাগে, মেয়েটি কি বাড়িতেই থাকত? তাকে কি ইস্কুলে পাঠানো হত না? তা হলে তো তার সহপাঠিনী, ইস্কুলের দিদিমণি— কেউ না কেউ প্রথম ঋতুর চিহ্ন দেখে বিষয়টি তাকে বুঝিয়ে বলতে পারত। তার অভিভাবকটিকে ডেকে কথা বলতে পারত। সে সব কিছুই কেন ঘটেনি সেটাই তো বিস্ময়ের।

নৈঃশব্দ্যের প্রহরা

উল্লাসনগরের এই ঘটনায় অভিযুক্ত পুরুষটির বিরুদ্ধে মনের ভিতরে প্রচণ্ড বিতৃষ্ণা তো স্বাভাবিক। কিন্তু সেই হত্যাকারীর জন্যে একটু তো মন খারাপও লাগছে। কিশোরীটি তো যন্ত্রণা পেয়ে নিহত হলই, কিন্তু এই হত্যার ফলে দাদাটির নিজের জীবন যে শুধু কারান্তরালে থেকে নষ্ট হবে তা-ই নয়, 'হত্যাকারী' আখ্যা নিয়ে সারাজীবন কাটাতে হবে, তার স্ত্রীকে 'হত্যাকারীর স্ত্রী' পরিচয় নিয়ে বাঁচতে হবে, হয়তো বা দীর্ঘ কারাবাসের ফলে সেই স্ত্রী এই স্বামীর পরিচয়ে বাঁচার পরিবর্তে নতুন কোনও সম্পর্কে জড়াবে যেটা এই মানুষটি কারাগারে বসে লোকমুখে খবর পাবে আর ক্ষোভে ভুগবে অথবা ঋতুমতী বোনের রক্তমাখা কাপড়ের ব্যাখ্যা পেয়ে অনুশোচনাতে জীবন কাটবে।

এই হত্যা শুধু যে ঋতু সম্বন্ধে অজ্ঞতার সাক্ষ্য তা নয়। কোনও নারীর সঙ্গে শরীরী সম্পর্কে জড়ালে সেই মেয়ের সতীচ্ছদ ছিন্ন হয়ে রক্তারক্তি হবে, এই ধারণাও কি এই হত্যার সঙ্গে জড়িয়ে নেই? আমাদের দেশে ছাত্রীদের তবু হয়তো বা সংকোচ কাটিয়ে বয়সের সঙ্গে শরীরের পরিবর্তন নিয়ে কিছু বলা যায়, কিন্তু ছাত্রদের সঙ্গে তা নিয়ে স্বচ্ছন্দে কথা বলতে পারেন খুব কম শিক্ষক-শিক্ষিকা। হয়তো তাদের অনেকেই বিশ্বাস করে যে ছাত্রছাত্রীদের বয়ঃসন্ধির শরীরী বদল, ঋতু, গর্ভাধান, গর্ভনিরোধক এ সব নিয়ে জানালেই তারা সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের শরীর নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা শুরু করবে। এমনকী এ সব নিয়ে জানাতে গেলে তারা 'পেকে' যাবে ভয়ে পরিবারের পক্ষ থেকেও আপত্তি উঠতে পারে। কিন্তু দেখা গেছে যে নিজেদের শরীর নিয়ে জানলে কিশোর-কিশোরীরাই দায়িত্বের সঙ্গে আচরণ করে। যেমন প্রথম শরীরী সম্পর্কে এই রক্তারক্তির অতিকথন পুরুষদের মধ্যে যে প্রত্যাশা আর মেয়েদের মধ্যে যে আশঙ্কা তৈরি করে, তাতে অনেক সময় সন্দেহের বীজ গভীর ভাবে বুনে যায়। নানা কারণে মেয়েদের সতীচ্ছদ ছিন্ন হতে পারে, এমনকী সাইকেল চালাতে গিয়ে বা খেলাধুলা করতে গিয়ে। এ ছাড়া এখন ইন্টারনেটের দৌলতে সবাই জ্ঞান অর্জন করে ফেলে। তাতে এমনকী রক্তের পাউডারের বেসাতিও চলছে, যেন ফুলশয্যার রাতে 'যথেষ্ট' রক্তক্ষরণ হয়, যাতে মেয়েটির চরিত্র নিয়ে সন্দেহ না হয়। সব স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞই কিন্তু একটি বিষয়ে সহমত, সকলের সতীচ্ছদ সমান হয় না। তাই রক্তপাত কারুর নাই হতে পারে। আর কারুর ক্ষেত্রে ছিটেফোঁটাও হতে পারে। ভারতে এ রকম সমীক্ষা নজরে পড়েনি, কিন্তু ইউএসএ-র একটি সমীক্ষায় বলছে মাত্র ৪৩% মেয়ের প্রথম সহবাসের পরে রক্তপাত হয়েছে, কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ছিটেফোঁটা। এই বিবাহিত দাদা কিশোরী বোনের পোশাকে রক্তের দাগ দেখে সহবাসের পরের রক্তের দাগের কথা ভাবতে পারল, তার মেয়েদের শরীর নিয়ে কি প্রত্যাশা?

তাই বোনকে সে গরম সাঁড়াশি দিয়ে ছ্যাঁকা দিয়ে স্বীকারোক্তি আদায়ের চেষ্টা করে গেল। কিশোরী কিছুই বুঝতে পারছে না এই রক্ত কোথা থেকে এল, সে এমনিতেই অজানা ভয়ে ভীত, তার উপরে দাদার হাতে গরম লোহার সাঁড়াশি! অতি সাহসী প্রাণও তাতে ভয় পেয়ে যাবে, আর এ তো এক ভীত কিশোরী। তাই এক দিকে ঋতু নিয়ে অজ্ঞতা আর অন্য দিকে প্রথম সহবাসের পরে নারী শরীর কী ভাবে নিজেকে 'অক্ষতযোনি' বলে প্রমাণ দেয় তা নিয়েও আকাশছোঁয়া ভুল ধারণা। তবে এই ভাবনাকে ব্যতিক্রম ভাবাটাই ভুল। পরিবারে ছেলেদের এ সব কথা বলা নিষিদ্ধ। তাই ছেলেদের জানার উৎস এখনকার সময়ে ভিডিয়ো যা আসলে পর্নোগ্রাফি ছাড়া আর কিছুই নয়। ছেলেদের শেখায় প্রথম সহবাসের পর এক রক্তারক্তির প্রত্যাশা। কারণ পর্নোগ্রাফিতে শরীরের সঙ্গে সঙ্গে আসে অনেক নির্যাতন, অনেক হিংসা। তাই পোশাকে রক্ত দেখে এক বছর তিরিশের দাদা মনে করতে পারে তা প্রথম সহবাসের ফল।

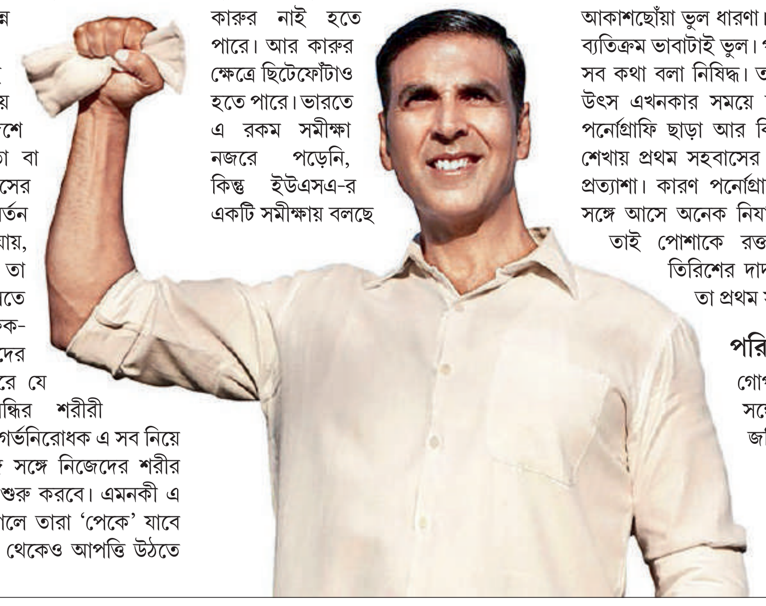

◀ রক্তকরবী। 'প্যাডম্যান' ছবিতে অক্ষয় কুমার

পরিবারের সম্মান

গোপনে কোনও পুরুষের সঙ্গে সহবাসের সম্পর্কে জড়িয়ে পরিবারের 'মাথা নিচু' করে দেবার শাস্তি আর কী হতে পারত এই দাদার কাছে? হয়তো বোনের চরিত্র ঠিক রাখতে তাকে ইস্কুলেও পাঠানো হত না। তাই দাদা যখন নিজেই নিশ্চিত হয়ে গেল যে বোন 'পরিবারের মাথা নিচু করে দেওয়ার' মতোই কোনও কাজ করেছে, তা হলে সেই 'অপরাধী'কেও চিহ্নিত করা হচ্ছে দাদার আশু কর্তব্য। সে জন্যে স্বীকারোক্তি আদায়ে কিশোরী বোনকে চরম শারীরিক যন্ত্রণা দেওয়া। মেয়েটি নিজেই জানে না তার শরীর ঘিরে কী হয়েছে। যদি আদৌ সে রকম কিছু ঘটত, তা হলে তো এই দাদা তিলমাত্র না ভেবে দু'জনকেই পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিত! আসলে সব হত্যা হত্যাই। পরিবারের সম্মানরক্ষার জন্য হত্যা বলে কিছু হয় না। কারণ সম্মানরক্ষার জন্য হত্যা বলে আমরা অপরাধীর জন্য একটু স্বস্তির পরিসর তৈরি করি, এতে যেন সেই হত্যার পক্ষে একটু সহানভূতি তৈরি হয়ে যায়। এই হত্যাকারীর প্রতি আমার সমবেদনা রয়েছে, কিন্তু কোনও সহানুভূতি নেই।

> ছাত্রীদের তবু হয়তো-বা সংকোচ কাটিয়ে বয়সের সঙ্গে শরীরের পরিবর্তন নিয়ে কিছু বলা যায়, কিন্তু ছাত্রদের সঙ্গে তা নিয়ে স্বচ্ছন্দে কথা বলতে পারেন খুব কম শিক্ষক-শিক্ষিকা।

উড়াও রক্তধ্বজা

কিশোরী বোনকে হত্যার অপরাধ থেকে বাঁচতেই শুধু নয়, জীবনের প্রয়োজনেই পুরুষমানুষের ঋতু-চেতনার প্রয়োজন। ঋতুকালীন স্বাস্থ্য মানে শুধু মেয়েরাই সচেতন হবে যে স্বাস্থ্যের নিরাপত্তার জন্য স্যানিটারি প্যাড ব্যবহার করতে হবে এবং গ্রামের মেয়েরা গত দশ বছরে কত বেশি অনুপাতে তা ব্যবহার শুরু করল তার পরিসংখ্যান? স্যানিটারি প্যাড, সে বহুজাতিকের হোক বা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর, তাতে যে ভাবে স্বাস্থ্যের 'মেডিক্যালাইজেশন' হচ্ছে, অন্যের ভরসায় থাকতে হচ্ছে, তার বাইরেও বেরিয়ে আসতে হবে তো? কেন কাপড় ব্যবহার করে কেচে রোদ্দুরে শুকোনো যাবে না? বিদেশে তো তা নিয়মিত হচ্ছে। এটা করতে পারলেই তো সংক্রমণের সমস্যা ৯০% কমিয়ে ফেলা যায়! ভারতে ৩৩.৬ কোটি মেয়ে রয়েছে যারা ঋতুমতী হয়। গ্রামে ৪৮% আর শহরে ৭৭% মেয়ে স্যানিটারি প্যাড ব্যবহার করে, তাতে ৯০০০ টন বর্জ্য উৎপন্ন হয়। কেন পুরুষরা সচেতন হয়ে সর্বত্র প্রচার শুরু করবে না যে ঋতুর কাপড় কেচে রোদ্দুরে শুকোনো একটা প্রয়োজনীয় পুনর্ব্যবহার? পুনর্ব্যবহারের কথা পরিবেশকর্মীরাও বলবে না কেন? ঋতুকালীন স্বাস্থ্যের সঙ্গে পুনর্ব্যবহারের এই বার্তা শুধু কোনও বিশেষ পুজোমণ্ডপেই নয়, সব উৎসবেই ছড়িয়ে পড়ুক।

লেখক সমাজকর্মী ও অর্থনীতিবিদ

আমার খাওয়া তো নয় 'খাওয়া'

ইন্ডিপপ

ইন্দ্রজিৎ হাজরা

উদয় দেব

আমি যে খাদ্যরসিক নই, সেটা আমার খাওয়া কোনও খাদ্যদ্রব্যকে জিজ্ঞাসা করলেই জানতে পারবেন। প্যারিসের এক ইতালিয়ান রেস্তোরাঁতে একবার লাসানিয়া অর্ডার করার পর আমি যখন ট্যাবাসকো সস চেয়েছিলাম, চিজ মাখানো মাংসের খাবারে একটু তো ঝাল-ঝাল ব্যাপার দরকার, ওয়েটার প্রায় চোখ দিয়ে আমায় ঘাড়ধাক্কা করে বার করে দিয়েছিল। পরে শুনি 'লে মন্ড' খবরের কাগজে খাবার-রেস্তোরাঁ নিয়ে লেখালেখির পাতায় ফরাসি লাসানিয়া সম্প্রদায় থেকে একটা জয়েন্ট স্টেটমেন্ট বেরিয়েছিল। সেটার একটা অংশে ওনারা লিখেছিলেন, 'মঁসিয় হাজরা যে রকম ভাবে আমাদের অপমান করার চেষ্টা করেছিলেন, তার একমাত্র তুলনা হল কাটা ঘায়ে নুন ছেটানো। এটা কোনও দেশের, কোনও সম্প্রদায়ের আত্মসম্মানসম্পন্ন খাদ্য মেনে নেবে না।'

আমার খাবারের মর্যাদা বোঝার অভাবের কথা একদম প্রথমেই বলছি, কারণ আর এগনোর আগে আমি এটা প্রমাণ করতে চাই যে ভালো খাবারের অভিজ্ঞতা, অন্তত বাইরে গিয়ে খাবারের অভিজ্ঞতা শুধু খাওয়া নয়, পরিবেশ, ব্যবহার, অবস্থান, খদ্দেরের কোলাহলও গুরুত্বপূর্ণ। রান্নার দক্ষতার থেকেও জরুরি।

তাই যখন এই সপ্তাহে কাগজে দেখলাম যে পার্ক স্ট্রিটের পিটার ক্যাট 'টেস্ট অ্যাটলাস' (ক্রোয়েশিয়ায়-স্থাপিত জনপ্রিয় অনলাইন 'ফুড গাইড' অনুযায়ী পৃথিবীর সেরা ১৫০ 'কিংবদন্তি' রেস্তোরাঁর লিস্টিতে ১৭ নম্বরে, তখন বুঝলাম যে পাঠকদের প্রিয় খাবারের জায়গা বাদ পড়ে যাওয়ার চিৎকার-হইচইয়ের আগে আমি আমার জ্ঞানভাণ্ডার থেকে চট করে দু'পয়সা প্লেটে বেড়ে দিই।

টেস্ট অ্যাটলাসে বলে রাখা আছে, 'এই জায়গাগুলো শুধু খাওয়ার জায়গা নয়, নিজের অধিকারে গন্তব্যস্থানও, পৃথিবীর বিখ্যাত মিউজিয়াম, গ্যালারি আর মনুমেন্টের সঙ্গে তুলনীয়। এখানকার রন্ধনসম্পর্কীয় বা সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য এড়িয়ে যাওয়া মানে সেই শহরের বিশেষ এক চেহারার ইতিহাস, ঐতিহ্য আর স্থানীয় স্বাদকে না পাওয়া।' এ ব্যাপারে পিটার ক্যাট যে কলকাতার একটা 'এস্টাব্লিশমেন্ট', কোনও সন্দেহ নেই। ওখানকার বিখ্যাত 'চেলো কাবাব', মূলত ইরানি কাবাব, মাখন, ভাত, আর ওপরে 'সানি সাইড আপ' ডিম ভাজা— পিটার ক্যাটের 'সিগনেচার ডিশ'। মেনুতে চেলো কাবাবের বর্ণনায় আছে 'পশ্চিমবঙ্গের সুরক্ষিত আঞ্চলিক পণ্য'।

খেতে ভালো বটে। অনেকেই বলে, হবে নিশ্চয়ই। তবে যতবার পিটার ক্যাট গেছি, আমি অন্য জিনিসই অর্ডার করেছি কারণ বিরিয়ানি, ফ্রাইড রাইস আর বাড়ির বাইরে খুব একটা ভাত খাই না, তাও কাবাবের সঙ্গে। আমার ওখানে আসল পছন্দ, কেমন ঢুকলেই বাইরের কলকাতার ক্যাঁচোরম্যাচর, চ্যাটচ্যাটে ভিড় ছেড়ে একটা উষ্ণ-কিন্তু-এ সি-র গমগমে আবহ। আর তার সঙ্গে আছে ওপরের লেভেলে বসার কাঠের সিঁড়ি। আর আছে পিটার ক্যাটের চমকে দেওয়া বেড়ালের কাট-আউট মেনু, যার ভেতর আছে আরও সুন্দর প্রচ্ছদ, সব থেকে আকর্ষণীয় হল একটা গোঁফওয়ালা হুলোর মুখ।

তবে এই চত্বরে ও শ্রেণিতে আমার সব থেকে প্রিয় রাস্তার উল্টো দিকে একই মালিকানার 'মোকাম্বো'। এখানে ঢুকলে মনে হয় যেন আমি সিনেমার এক চরিত্র— বিশেষত 'দ্য গডফাদার'। লাল চামড়ার বৃত্তাকার সিট, নিচুতে ঝোলানো মাথার কাছে প্রায় নামানো ল্যাম্পশেড-ওয়ালা নম্র 'হলদে' আলো, আর একটা বর্ণনাতীত ক্লাস, যেটার সঙ্গে অন্য টেবিলে কে বসে আছে না আছে-র কোনও সম্পর্ক নেই। আছে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি বা এথেন্সের পার্থেনন, বা দিল্লির পুরানা কেল্লার মতো মোকাম্বোর 'জায়গা'তে।

(একবার এক খদ্দের তার ড্রাইভারকে নিয়ে এসেছিলেন খেতে। ড্রাইভারকে ঢুকতে দেওয়া হয়নি কারণ তাঁকে নাকি ড্রাইভারের মতো 'দেখাচ্ছিল'। এই ঘটনার পর কিছু বছর আমি মোকাম্বো এড়িয়ে চলেছিলাম। তার পর যখনই ফিরে গেছি, যতটা পারি 'ড্রাইভার'-এর মতো জামাকাপড়, চালচলনের চেষ্টা করেই গেছি। বিলের সময়ে টাকার জোর ড্রাইভার আর মালিকের একই হওয়ার জন্য হয়তো কর্তৃপক্ষ এই সত্যটা অবশেষে মেনে নিয়েছে আশা করা যায়।)

আমার অনেক জায়গার বিশেষ খাবার প্রিয়। দিল্লির পান্ডারা রোডে 'ইচিবান'-এর চিমনি সুপ, মুম্বইর কালা ঘোড়া এলাকায় 'তৃষ্ণা'র গার্লিক কাঁকড়া, কলকাতায় সেন্ট্রাল এভিনিউতে 'চাং ওয়া'র চিলি চিকেন (ড্রাই) ও এসএন ব্যানার্জি রোডে 'মোহন ভাণ্ডার'-এর হিঙের কচুরি-তরকারি-লঙ্কা।

বেলেঘাটায় 'সত্যনারায়ণ ভাণ্ডার'-এর মোঘলাই পরোটা, হালকা, কুড়কুড়ে বাইরেটা, হালকা নরম ডিম ভেতরে; আর হলদে উষ্ণ আলুর সঙ্গে তাল পাকিয়ে খাওয়া... আঃ হা হা! অনেকের মতে হয়তো এটা 'আসল মোঘলাই'-ই নয়। ডোন্ট কেয়ার। কিন্তু সত্যনারায়ণের বাইরে প্লাস্টিক চেয়ারে বসে এই অসাধারণ মোঘলাই পরোটা খাওয়ার তুলনা হয় না।

এ রকম অনেক জায়গা আছে। কিন্তু এই জায়গাগুলো কোনও দিনও ওই ভাবে কিংবদন্তি হবে না। ম্যাক্সিমাম নস্টালজিয়া-খেকোদের 'অনাদি কেবিন', 'নিরঞ্জন আগার', 'কফি হাউস' ইত্যাদির মতোই চলবে, ওটাতেই সবাই খুশি। এ দিকে পিটার ক্যাট বা মোকাম্বো হোক, বা প্যারিসে 'ব্রাসেরি লিপ' বা প্রাগের 'কাফে ল্যুভর' হোক, ওগুলো যাওয়ার জায়গা, অনেক ক্ষণ বসে থাকার জায়গা। খাবারটা প্রায়— 'প্রায়' বললাম কিন্তু— আনুষঙ্গিক। আর আমার ছোটকাকা যা বলত, 'ড্রিঙ্কস না থাকলে খাবারের সঙ্গে এই রকম জায়গাগুলোতে মজলিশ হবে কী করে?!'

নাম দিয়ে যায় চেনা

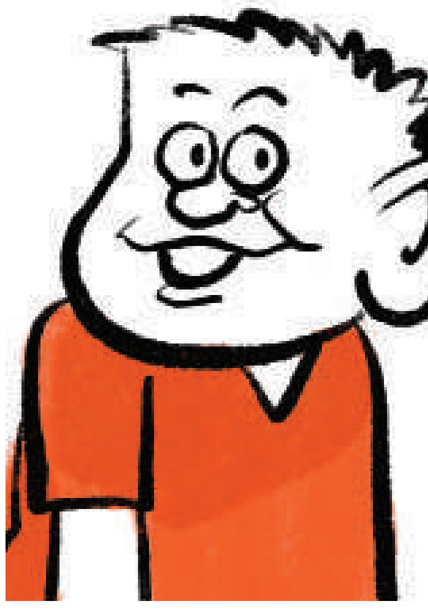

লম্বকর্ণ

বাংলা সাহিত্যের অন্যতম জনপ্রিয় কমিকস-স্রষ্টা নারায়ণ দেবনাথের 'বাঁটুল দি গ্রেট' সিরিজে পাঠকেরা 'লম্বকর্ণ' নামের এই কৌতুকপ্রদ চরিত্রটিকে খুঁজে পেয়েছিলেন। 'লম্বকর্ণ' শব্দটির আভিধানিক অর্থ, যার কানগুলি লম্বা। পরশুরামের গল্পে এই অভিধাটি পেয়েছিল একটি ছাগল। তবে এ ক্ষেত্রে নামটি আক্ষরিক। অতিমানব বাঁটুলের খুদে বন্ধু হল এই লম্বকর্ণ। কান দুটো স্বাভাবিকের চেয়ে বেশ খানিকটা বড়সড় হওয়ায় সে অনেক দূরের সামান্য আওয়াজও স্পষ্ট ভাবে শুনতে পায়। এক বার তো এক মাইল দূরে নদীর উপর বাচ্চু আর বিচ্চু মাছ ধরার সময়ে ফিসফিস করে কী কথা বলছিল সেটাও শুনতে পেয়েছিল। এক বার ডাকাত দলের রেল লাইনের ফিশপ্লেট খোলার শব্দ বহু দূর থেকে শুনতে পেয়ে বাঁটুলদার সহায়তায় ডাকাতির হাত থেকে যাত্রীদের বাঁচিয়েছিল লম্বকর্ণ। লম্বা লম্বা কানের এমন আশ্চর্য শ্রবণ ক্ষমতা যার, তার নাম 'লম্বকর্ণ' না হলে কি চলে!

লেখাটি পাঠিয়েছেন: রতন কুমার দাস
বেলডাঙা, মুর্শিদাবাদ

এমন আর কোন কোন চরিত্র আছে যাদের নামের অর্থ থেকেই মালুম হয় তাদের কীর্তিকলাপ এবং বৈশিষ্ট্য?

আপনাদের এ রকম আরও চরিত্র মাথায় এলে নিশ্চয়ই হাত নেড়ে আপনার নাম এবং ঠিকানা সহ লিখে জানাবেন সঙ্গের এই ই-মেল ঠিকানায়:
pratisampadak.eisamay@gmail.com।